একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Nakul Mallick's short stories: Soul-searching and the embodiment of resistance in Dalit life

নকুল মল্লিকের ছোটগল্প: দলিত জীবনের আত্মানুসন্ধান ও প্রতিরোধচেতনার রূপায়ণ

Name of the Author: SANDEEP XESS

Affiliation: Research Scholar, Bengali Department, The Sanskrit College And University, Kolkata, West Bengal, India

Abstract: This paper examines the emergence and significance of Dalit literature in Bengali literary discourse with a particular focus on the works of Nakul Mallik. Dalit literature, as a distinct literary movement, articulates the lived experiences of marginalized communities who have historically faced caste-based oppression, social exclusion, and systemic injustice. Unlike mainstream literary representations, which often portray subaltern lives through sympathetic yet external perspectives, Dalit writing foregrounds an internal voice rooted in lived reality, resistance, and identity formation.

The study explores how Nakul Mallik's short stories embody this transformative literary consciousness by representing marginal lives not merely as victims but as active agents of resistance. Through close textual analysis of selected stories such as *Chashar Byata*, *Marichika*, *Bibartan*, *Neta*, *Shudrakanya*, and *Durga Durgatikarini*, the paper highlights themes of caste hierarchy, class conflict, state violence, gendered marginality, and ideological disillusionment. The use of raw, unembellished language and regional idioms further reinforces the authenticity of Dalit experience and challenges the aesthetic norms of mainstream literature.

The paper also engages with theoretical perspectives of marginality and subalternity, particularly in relation to questions of voice, representation, and agency. By situating Mallik's work within broader socio-political and historical contexts, the study argues that Bengali Dalit literature functions not only as a narrative of suffering but as a powerful cultural and political discourse that reclaims dignity, asserts identity, and resists hegemonic structures.

Keywords : Dalit Literature, Marginality, Nakul Mallik , Subaltern Studies, Caste System, Social Inequality, Resistance, Identity Formation, Bengali Short Stories, Cultural Politics

নকুল মল্লিকের ছোটগল্প: দলিত জীবনের আত্মানুসন্ধান ও প্রতিরোধচেতনার রূপায়ণ

সন্দীপ খেস

বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল ও সুপ্রাচীন প্রেক্ষাপটে দলিত সাহিত্যের অবস্থান ও আলোচনার পরিসর আজও তুলনামূলকভাবে বেশ সীমিত। সাহিত্যের এই স্বতন্ত্র ধারাটি খুব বেশি দিনের পুরোনো নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থায় যে সমস্ত মানুষ চরম অবহেলা, লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হয়েছেন, তাদের নিজেদের কলমে লেখা নিজেদের যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের আখ্যানই হলো 'দলিত সাহিত্য'। সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের দ্বারা শোষিত, অন্ত্যজ এবং প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের দীর্ঘদিনের চাপা পড়া ক্ষোভ, জীবনসংগ্রাম এবং বেঁচে থাকার রুক্ষ বাস্তবতাই এই সাহিত্যের মূল উপজীব্য।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং ভাষার সাহিত্যে দলিত আন্দোলন অনেক আগে থেকেই প্রবল আকার ধারণ করলেও, সেই তুলনায় বাংলায় দলিত লেখকদের সক্রিয় সাহিত্য আন্দোলন বেশ নবীন। তবে এই বিলম্বিত সূচনা সত্ত্বেও, এই আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সচেতন এক তাগিদ থেকে। দলিত সমাজের যে মানুষেরা শতকের পর শতক ধরে প্রান্তিকে অবস্থান করছিলেন, তাঁরাই যখন নিজেদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা, নিজস্ব জীবনবোধ এবং আত্মপরিচয় বা 'আইডেন্টিটি'-র নিরন্তর খোঁজ নিয়ে সাহিত্যের মূল স্রোতে অবতীর্ণ হলেন, তখনই জন্ম নিল এক নতুন সাহিত্যিক চেতনার। বহু গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকার হাত ধরে এই আন্দোলন ক্রমশ তার নিজস্ব জমি তৈরি করতে শুরু করে।

দীর্ঘদিনের এই অবদমন থেকে বেরিয়ে এসে দলিত মানুষের এই যে আত্মানুসন্ধান এবং সাহিত্যিক জাগরণ—এর প্রয়োজনীয়তা এবং পেছনের রূঢ় বাস্তবতাটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে নকুল মল্লিকের দর্শনে। যুগ যুগ ধরে প্রান্তিক মানুষের মনন কীভাবে শৃঙ্খলিত ছিল এবং কেন এই সাহিত্যিক চেতনার উন্মেষ এত জরুরি ছিল, সেই প্রেক্ষাপটটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নকুল মল্লিক তাঁর 'প্রবন্ধ নিবন্ধ' গ্রন্থে বলেছেন–

> "দলিত সমাজের বেশিরভাগ মানুষের জ্ঞানস্পৃহা নেই, নেই কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা প্রবাহমান স্রোতধারায় তাদের জীবন বয়ে চলেছে... যে জাতির চেতনা বিকশিত হয় না, সে জাতি কখনও আত্মমূল্যায়ন করতে পারে না। আত্মমূল্যায়ন না করলে আত্মোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার উদ্রেক হয় না। দলিত সমাজ পুরুষানুক্রমে কেবল মাটি চাষ করেছে, মনের চাষ করেনি, শরীর বৃত্তির অভাব পূরণে সচেষ্ট থেকেছে, হৃদয় বৃত্তিকে জাগরিত করার কথা ভাবেনি।"[১]

নকুল মল্লিকের এই আক্ষেপ মূলত সেই হাজার বছরের স্থবিরতা ভাঙারই ডাক। বাংলা দলিত সাহিত্যের এই নবজাগরণ আসলে সেই দীর্ঘদিনের অনাবাদি 'মনের চাষ' করার এবং সাহিত্যিক আত্মমূল্যায়নেরই এক ঐকান্তিক ও শৈল্পিক প্রচেষ্টা।

সমাজের একেবারে প্রান্তিক স্তরে বসবাস করলেও এই নিম্নবর্ণের মানুষেরা নিরলসভাবে সমাজকে নানা অপরিহার্য পরিষেবা দিয়ে টিকিয়ে রাখেন, যা অমোঘ সত্য। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই মানুষগুলি সম্পর্কে বৃহত্তর সমাজের চেনা-জানার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। যুগ যুগ ধরে মূলধারার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের কেবল গৎবাঁধা ছকে বা নির্দিষ্ট কাঠামোর অন্ধকূপে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রথিতযশা ছোটগল্পকারের হাত ধরে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন বারবার উঠে এসেছে। শিল্পীর সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীল স্পর্শে সেই চরিত্রগুলি সাহিত্যের পাতায় অমরত্বও লাভ করেছে এবং সেই সব সাহিত্যকর্ম মহৎ সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু মূলধারার সাহিত্যিকের কলমে ফুটে ওঠা সহানুভূতির চিত্র আর দলিত মানুষের আত্মজৈবনিক যন্ত্রণার মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যায়। দলিত সাহিত্য সেই ফারাক ঘুচিয়ে প্রান্তিক মানুষকে দয়ার পাত্র থেকে রক্ত-মাংসের সংবেদনশীল ও প্রতিবাদী চরিত্রে রূপান্তর করে।

এই রূপান্তরের নেপথ্যে দলিত সাহিত্যের নিজস্ব ভাষাশৈলীর এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। দলিত সাহিত্যের ভাষা এবং গঠন মূলধারার সাহিত্য থেকে একেবারেই আলাদা। প্রথমত, এই সাহিত্যে আঙ্গিকের চেয়ে বিষয়ের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। এখানে বাহ্যিক সৌন্দর্য, রূপক, অলংকার বা কল্পনাবিলাসের কোনো স্থান নেই; বরং ভাষার কৃত্রিম চাকচিক্যের চেয়ে জীবনের রূঢ় ও কঠিন বাস্তবতায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের পরিশীলিত ও মার্জিত ভাষার পরিবর্তে এই সাহিত্যে সরাসরি ব্যবহার করা হয় প্রান্তিক মানুষের প্রাত্যহিক মুখের ভাষা। মূলধারার সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে দলিতদের এই যাপনের ভাষার আকাশপাতাল তফাৎ রয়েছে। দলিত সাহিত্যের ভাষা অত্যন্ত অমসৃণ, অলংকারহীন এবং রূঢ়। কারণ অবহেলিত মানুষের জীবনযাপনের সংগ্রাম, যন্ত্রণা এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটে তাদের এই নিজস্ব বুলি বা উপভাষার মাধ্যমেই। এ ভাষা কোনো কাল্পনিক জগত তৈরি করে না, বরং মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের বাস্তবতাকে সরাসরি তুলে ধরে। নকুল মল্লিকের ছোটগল্পের ভাষাশৈলীতে প্রান্তিক মানুষের এই অকৃত্রিম ও রূঢ় বাস্তবতারই সার্থক ও নিপুণ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় প্রান্তিকতা কোনো দৈবঘটনা নয়; তা একপ্রকার সুসংগঠিত এবং পরিকল্পিত সামাজিক প্রক্রিয়ার ফসল। এই প্রান্তিকতার ধারণাটি মূলত পরিচয়তত্ত্ব বা আইডেন্টিটি পলিটিক্স-এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যেখানে ধর্ম, জাতি, ভাষা কিংবা লিঙ্গীয় পরিচিতিকে হাতিয়ার করে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে মূলধারা থেকে বিযুক্ত করে রাখা হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এই বঞ্চনার ইতিহাস আরও গভীরে প্রোথিত। দীর্ঘকালীন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা এবং কঠোর বর্ণপ্রথা এখানে প্রান্তিকতাকে এক অনন্য জটিলতা দান করেছে। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের আড়ালে মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে যে অগণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, তা মূলত এক বিশেষ সুবিধভোগী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। এখানে নারীর জীবনকেও পিতৃতান্ত্রিক ও বর্ণবাদী শৃঙ্খলে বন্দি করা হয়েছে যাতে জাতিগত ও শ্রেণিগত আধিপত্য বজায় থাকে।

ঐতিহাসিক এই বঞ্চনার পাশাপাশি আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে দলিত জীবনের যে এক নতুন মাত্রার সংকট তৈরি হয়েছে, তা মূলধারার সাহিত্যে আজও অনেকাংশেই অনালোচিত। বর্তমান যুগে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মেধা ও বুদ্ধির জোরে যেসব দলিত তথা নিম্নবর্গের মানুষ সমাজের ওপরতলায় বা উচ্চমহলে পা রাখার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁদের সংগ্রাম কেবল প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নয়। প্রতিষ্ঠার পরেও প্রতিনিয়ত বর্ণবৈষম্যের যে অদৃশ্য অথচ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় তাঁদের এফোঁড়-ওফোঁড় হতে হয়, সেই তীব্র মানসিক রক্তক্ষরণের চিত্র আজ পর্যন্ত সেভাবে কোনো বাংলা উপন্যাসে পূর্ণাঙ্গভাবে ধরা পড়েনি। আধুনিক সময়ের যূপকাষ্ঠে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত দলিতদের বলি হওয়ার এই করুণ কাহিনি আমাদের চারপাশের সমাজে কোনো বিচ্ছিন্ন বা নতুন ঘটনা নয়। উচ্চশিক্ষিত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সফল হওয়া সত্ত্বেও কেবল নিচু জাতে জন্মানোর তথাকথিত 'অপরাধে' সহকর্মীদের কাছ থেকে পদে পদে অপমান ও মানসিক আঘাতে জর্জরিত হওয়ার অজস্র জ্বলন্ত উদাহরণ সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। প্রান্তিক জীবনের এই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বঞ্চনা, বর্ণবাদী কাঠামোগত শোষণ এবং আধুনিক দলিত জীবনের অদৃশ্য সংকট—এই সবকিছুর বিরুদ্ধে সাহিত্যিক লড়াইয়ের ময়দানে নকুল মল্লিক অবিস্মরণীয় নাম। অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায় জন্ম নেওয়া এই লেখক নমঃশূদ্র জনজাতির প্রতিনিধি হিসেবে নিজের জীবন ও সাহিত্যকে প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে উৎসর্গ করেছেন। নকুল মল্লিকের সাহিত্যচর্চা মূলত তার সামাজিক দায়বদ্ধতার এক শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ। বিংশ শতকের আশির দশকে বঙ্গীয় দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি 'বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ' এবং 'দলিত কণ্ঠ' পত্রিকার মাধ্যমে যে জাগরণ তৈরি করেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ঘরানার জন্ম দেয়।

তাঁর ছোটগল্পগুলোতে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের যাপিত জীবন অত্যন্ত নিপুণভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল– ***চাষার ব্যাটা, দুর্গা দুর্গতিকারিণী, স্বর্গপ্রাপ্তি, বার দশমী, মরীচিকা, প্রতিশোধ, নীলরতন, বিবর্তন, নেতা, শূদ্রকন্যা*** প্রভৃতি গল্পে তিনি শোষণের চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি সমাজের নৈতিক অবক্ষয় এবং জাতিবিন্যস্ত কাঠামোর অসারতাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছেন। তথাকথিত ভদ্র ও সভ্য সমাজের আরোপিত বিধিনিষেধের অন্তঃসারশূন্যতা উন্মোচন করাই তাঁর সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্যের হাতিয়ার করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, দলিত সাহিত্য শুধু যন্ত্রণার আখ্যান নয়; তা আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এক শাণিত প্রতিরোধ।

'চাষার ব্যাটা' গল্পটি শারদীয় 'অদল বদল' পত্রিকায় ১৪০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গল্পে গ্রামীণ বাংলার সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্য এবং বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র শৈল্পিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। গল্পের নায়ক সুধন্য সরকার প্রচলিত 'চাষা' বা 'অন্ত্যজ' পরিচয়ের গ্লানিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে শোষক শ্রেণির দর্প চূর্ণ করেছেন। এই গল্পে শুধু প্রতিশোধের কথা বলা হয়নি তার পাশাপাশি সমাজের নিচুতলার মানুষেরা কীভাবে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া সম্মান ও অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে, তারই স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

গল্পকার অত্যন্ত নিপুণভাবে উচ্চবর্গের ঔদ্ধত্য ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের ভাষাগত আচরণের মাধ্যমে। জমিদার মতি মজুমদার যখন নিম্নবর্ণের মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন, তখন তার ভাষা হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক ও বর্ণবাদী। এই শোষণের রূপটি প্রকট হয় যখন তিনি বলেন:

> "চাষার ব্যাটা চাষা, ওজন বোঝেনা, একলাফে গাছের মাথায় উঠতে চায়। এই সব ছোটজাত পূজো দেবার অধিকার পেয়েছে, সেটাই বেশী, আবার মন্দিরের ভিতর ঢুকতে চায়! কিছুতেই তা হবে না।"[২]

এখানে 'ছোটজাত' শব্দটি সমাজের গভীর ক্ষতকে নির্দেশ করে। গল্পের গদ্যরীতি ঋজু এবং নাটকীয় সংলাপে ভরপুর। সুধন্য সরকারের চরিত্রটি বিবর্তিত হয়েছে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে। স্কুলের মিটিংয়ে যখন তাকে 'চাষার ব্যাটা' বলে অপমান করা হয়, তখন সে প্রথাগত শিষ্টাচার ভেঙে নিজের সত্তাকে ঘোষণা করে বলে–

> "কথায় কথায় চাষার ব্যাটা চাষা, আমি যদি চাষা হই তো, আপনি আমার বলদ।"[৩]

এই বাক্যই শোষক ও শোষিতের চিরাচরিত সম্পর্কের সমীকরণকে ওলটপালট করে দেয়। গল্পের চূড়ান্ত পর্যায়ে সুধন্য সরকার জমিদারের অহংকারকে আক্ষরিক অর্থেই ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। চাষের জোয়ালে বদ্ধ জমিদারের ক্রন্দনরত অবস্থার বিপরীতে সুধন্য যখন হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে–

> "দেরি করিসনে, বেলা গ'ড়ে যাচ্ছে, জমিদার বাবুরি জোয়ালে জোড়, আমি এট্টু চষি। ...দেখো ন্যাও, আমি কত বড় চাষার ব্যাটা চাষা, চাঁড়ালের ব্যাটা চাঁড়াল। ঠায় ঠায় ঠায়...।"[৪]

সুধন্য সরকারের এই প্রতিবাদ ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নয়; তা দীর্ঘদিন ধরে লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষের মৌনতা ভঙ্গের ঐতিহাসিক মুহূর্ত। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর তাত্ত্বিক অন্বেষণে প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রান্তিক মানুষের স্বকীয় কণ্ঠস্বর নিয়ে। তিনি লিখেছিলেন:

> "The subaltern cannot speak. There is no virtue in global laundry lists with 'woman' as a pious item. Representation has not withered away."[৫]

স্পিভাক সেখানে দেখিয়েছেন যে, সমাজ ও ক্ষমতার কাঠামো অবদমিত মানুষের কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রিত (Represented) করে রাখে, সেখানে এই গল্পের সুধন্য সরকার জমিদারের ভাষায় কথা না বলে নিজের আঞ্চলিক ভাষায় উত্তর দিচ্ছেন। সুধন্য সরকার স্পিভাকের নেতিবাচক আশঙ্কার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সক্রিয় 'এজেন্সি' (Agency) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং শোষক শ্রেণির ভাষাকে ব্যঙ্গ করে নিজের পরিচয়কে পুনঃস্থাপন করেছে।

'মরীচিকা' গল্পটি শারদীয় 'অদল বদল' পত্রিকায় ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত। এই গল্পে মূলত সমাজের প্রান্তিক ও শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার মর্মস্পর্শী দলিল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিকাশ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে লেখক চূড়ান্ত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ছবি এঁকেছেন। এখানে উন্নয়ন বা মুক্তির স্বপ্নগুলো সাধারণ মানুষের কাছে কেবলই 'মরীচিকা' বা মায়াজাল হয়ে ধরা দেয়। গল্পের সমাজতাত্ত্বিক অবস্থান স্পষ্ট হয় যখন লেখক বলেন:

> "মানুষের মাঝে দুটো শ্রেণী, ধনী আর গরীব, বুর্জোয়া আর সর্বহারা। বুর্জোয়াদের খতম করে সর্বহারা মেহনতি মানুষের সরকার একদিন হবে।"[৬]

তখন এই বক্তব্যের দ্বারা লেখকের গদ্যরীতিতে রাজনৈতিক আদর্শবাদের বিপরীতে নিস্পৃহ দহন খেলা করে। দলিত শ্রেণীর মানুষের কাছে পেটের দায় সব থেকে বড়, সেখানে বড় বড় তত্ত্ব কেবলই শব্দের আস্ফালন। বিকাশের মানসিক সংকটের মধ্য দিয়ে এই সত্যই বারবার উঠে এসেছে:

> "বিকাশ এই সব কেবল ভাবছে। কোন কাজে মন লাগে না। সংসারের নির্মম দারিদ্র্য ও অমর্যাদার মাঝে জীবন আধমরা হয়ে থাকে। অথচ কিছুরই সমাধান হলো না।"[৭]

এই গল্পে মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গটি কেবল রাজনৈতিক পটভূমি নয়, বরং তা দণ্ডকারণ্য-প্রত্যাগত উদবাস্তু শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার চরম সংকটের প্রতীক। লেখক এখানে দেখিয়েছেন কীভাবে একদল ভূমিহীন মানুষ নিজেদের কঠোর শ্রমের দ্বারা স্বপ্নের ঘর তৈরি করেছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের নির্মমতা সেই স্বপ্নকে 'মরীচিকা'য় পরিণত করে। নিম্নবর্গের এই মানুষগুলো যখন বুঝতে পারে যে তথাকথিত 'সর্বহারার সরকার' তাদের পাশে নেই, বরং তাদের ওপরই খড়্গহস্ত, তখন গল্পের ভাষা আরও তীক্ষ্ণ ও সমালোচনামূলক হয়ে ওঠে:

> "সর্বহারার সরকার হয়ে, আজ কেন মরিচঝাঁপির সর্বহারাদের ওপর গুলি করে মারা হয়? কেন তাদের মা বোনদের ওপর অত্যাচার করা হয়? কে বলবে এ সব? দেশ জুড়ে সেন্সর কাওয়াজ।"[৮]

'মরিচঝাঁপির গণহত্যা: একালের কারবালা' প্রবন্ধের ঐতিহাসিক দলিলের সাথে এই গল্পের শৈল্পিক হাহাকারের অদ্ভুত মিল রয়েছে। প্রবন্ধে যেমন উল্লেখ আছে—

> "প্রান্তিক সুন্দরবনে তার অবস্থান। সেখানে বর্ণরিক্ত এক জনগোষ্ঠী যারা দণ্ডকে ছিল নির্বাসিত, তারা বসতি গড়তে চাইল; সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে। রাষ্ট্র তার প্রধান বাধা।"[৯]

সাহিত্য ও ইতিহাসের এই মেলবন্ধন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে, ক্ষমতার পটপরিবর্তন হলেও প্রান্তিক মানুষের ভাগ্য চিরকালই রাষ্ট্রের নিষ্ঠুরতার যূপকাষ্ঠে বলি হয়।

'দুর্গা দুর্গতিকারিণী' গল্পটি 'বহুজন নায়ক' পত্রিকায় অক্টোবর ১৯৯৪ প্রকাশিত হয়। এই গল্পে প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা নিয়ে বাবু পাড়া ও সর্দার পাড়ার মধ্যকার সংঘর্ষের ছবি ফুটে উঠেছে। এই রক্তক্ষয়ী বিবাদে বাবু পাড়ার কাছে সর্দার পাড়ার পরাজয় ঘটলে যুবক ঘোতন সেই চরম গ্লানি ও অপমান সহ্য করতে পারেনি। পরাজয়ের ক্ষোভে অন্ধ হয়ে ঘোতন মনে করে দেবী দুর্গা তাদের সহায় হননি, এবং তাদের এই সর্বনাশের মূল কারণ স্বয়ং দেবী। নিজেকে পরাজিত অসুরের প্রতিনিধি কল্পনা করে সে প্রতিহিংসায় মেতে ওঠে এবং বিসর্জিত প্রতিমার বুকে সজোরে সরকি বিঁধিয়ে দেয়। আক্রোশ আর দম্ভের এই লড়াইয়ে দেবী দুর্গা এখানে ঘোতনের কাছে 'দুর্গতিনাশিনী' নন, বরং পরাজয় বা দুর্গতিকারিণী।

> "এই হতভাগীকের জন্যে যাতে গণ্ডগোল, যাতে সর্বনাশ। কা দরকার তোর আহেক? তোখে ঠাকুর অসুর কোনহো কারে নেই পারলে। হামে জ্যান্ত অসুর, তোখে খুনকার ফেলবই।"[১০]

এমনই এক গল্প 'বার দশমী'। এই গল্পেও দেখানো হয়েছে দেবী দুর্গা হলেন, আর্য সমাজের প্রতিনিধি এবং অসুর হলো অনার্য সমাজের প্রতিনিধি বা নিম্ন বর্ণের প্রতিনিধি। তাকে অসহায় ভাবে নিধন করেছেন দশ ভূজা দুর্গা। গল্পে ধীরেন মন্ডল তার পুত্রবধূ শ্যামলীকে বলে–

> "...কবে সেদিন আসবে যেদিন অসুর আবার জেগে উঠবে, আমরা করব জয়। আমাদের জন্ম জন্মান্তরের দাসত্ব ঘুচে যাবে।"[১১]

এর মাধ্যমেই বোঝা যায় দশমীর দিন এই সমাজের কাছে আনন্দ উৎসব নয় তার বদলে শোক পালনের দিন।

'বিবর্তন' গল্পটি সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের 'বাবু' সংস্কৃতি এবং প্রান্তিক শ্রমজীবী নারী সমাজের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক যুদ্ধের জীবন্ত আখ্যান। এই গল্পে কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম মুখ্য হয়ে ওঠেনি, বরং 'জাত' ও 'আভিজাত্যের' যে মিথ্যে অহংকারের ওপর উচ্চবিত্তের ভিত দাঁড়িয়ে আছে, তাকেই লেখক তীব্রভাবে কুঠারাঘাত করেছেন। গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, বাবুদের ঘরের আভিজাত্য পুরোপুরি শ্রমজীবী নারীদের সেবার ওপর নির্ভরশীল। অথচ এই নির্ভরশীলতাকে তারা অস্বীকার করে কেবল অবজ্ঞা আর জাত-পাতের নোংরা খেলায় মেতে ওঠে। ময়নার সংলাপের মাধ্যমে এই বিষয়টি ফুটে ওঠে–

> "রোজ রোজ জাতের খোঁটা শুনতে হয় আমাকে, কাজে যদি একটু ভুল ত্রুটি হয় অমনি বাবুগিন্নি গাল দেয়—ছোট জাতের মেয়ে, তোরা জানবি কী, ঘেন্না করে তোদের হাতে খেতে।"[১২]

কাহিনীর মোড় ঘোরে শুভদ্রার নেতৃত্বে যখন নারীরা তাদের অদৃশ্য শেকলগুলো চিনতে পারে। নিম্নবর্গের এই আত্মমর্যাদাবোধ শুধুমাত্র মজুরি বৃদ্ধির লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা সামাজিক সমমর্যাদা আদায়ের লড়াইয়ে

পরিণত হয়। অহংকারী বাবুরা যখন নিরুপায় হয়ে তাদের ফিরিয়ে নিতে আসেন, তখন শুভদ্রার কণ্ঠে যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, তা বৃহত্তর সামাজিক 'বিবর্তন'-এর চূড়ান্ত ঘোষণা:

> "আপনাদের উঁচু বর্ণের মেয়েদের ঘরের কাজে লাগান, তাহলে হাঁড়ি ছোঁয়ায় দোষ হবে না, মন্দিরে ঢুকলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, ছোট জাত ব'লে তাদের কেউ ঘেন্না করবেনা।"[১৩]

'বিবর্তন' গল্প বিদ্রোহের কাহিনী হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়। বাবুদের অসহায় আত্মসমর্পণ প্রমাণ করে যে, তথাকথিত 'জাত' আসলে কর্মহীন অলসতার আবরণ মাত্র।

নকুল মল্লিকের 'নেতা' গল্পে সাহিত্যিক দর্শনের মধ্য দিয়ে সমকালীন গ্রামীণ রাজনীতির ভয়াবহ অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে ওঠে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দীনতারণ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে রাজনীতির নেতা বা কর্মকর্তারা ব্রাত্য শ্রেণির মানুষের বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে ক্ষমতার শিখরে পৌঁছায়। কাঞ্চনপুর গ্রামের নমঃশূদ্র, বুনো, বাগদী ও কৈবর্ত পাড়ার মানুষ দীনতারণ বাবুকে একান্ত আপনজন বলে মনে করে। কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দে আসীন হওয়ার পরেই তার মেকি নিপীড়িত-দরদি রূপ খসে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে আন্তোনিও গ্রামসির 'আধিপত্য' (Hegemony) তত্ত্বটি উল্লেখ করা যায় যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, শাসক শ্রেণি অবদমিত শ্রেণির সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়ে সুকৌশলে তাদের সম্মতি (Consent) আদায় করে নেয়। গল্পে তাই দেখা যায় রাজেন মণ্ডলের অসুস্থ মেয়ের জন্য যখন সামান্য চিঠির প্রয়োজন হয়, তখন নেতার কাছে সাধারণ মানুষের জীবনের চেয়ে অফিস কাছারির ফ্যাশন অনেক বেশি বড় হয়ে দাঁড়ায়:
"চিঠি পত্তোর আমি কাউকে লিখতে পারব না বাপু। আমার কথা মুখে বললে যে তাতেই হবে, যা—পালা।"[১৪]
গল্পের শেষে রাজেনের মেয়ের মৃত্যু এবং নেতার নির্বিকার উক্তি— "তোরা একটু আগে থেকে আমায় খবরটা দিবি তো"—রাজনীতির চূড়ান্ত অসংবেদনশীলতাকেই প্রমাণ করে। শাসক শ্রেণির কাছে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণি কেবল ভোটের সংখ্যা (Vote Bank) মাত্র।

'শূদ্রকন্যা' গল্পটি বিশ শতকের শেষভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এর মূল সুরে হাজার বছরের বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র চপেটাঘাত ধ্বনিত হয়েছে। লেখক এখানে মণীষা ও সৌগতর দাম্পত্য সংকটের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্ণের তথাকথিত শুচিতা বনাম নিম্নবর্গের মানবিকতার দ্বান্দ্বিক লড়াই অত্যন্ত নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। গল্পের মূল সংঘাত শুরু হয় যখন সৌগতর পরিবার মণীষাকে শিক্ষিত পুত্রবধূ হিসেবে পরিচয় না দিয়ে শূদ্র পরিচয় দিয়ে বিচার করে।

"প্রেম ভালবাসার ফাঁদ পেতে আমার ছেলের ঘাড়ে চেপে জাতে উঠলে। ...কুকুর যদি বলে, আমি মানুষকে ঘৃণা করি না, তাতে মানুষের কী যায় আসে! হাঃ হাঃ হাঃ!"[১৫]

শাশুড়ির কণ্ঠে যখন উচ্চারিত হয়–"অজাত কুজাতের ধরা ছোঁয়ায় থাকতে চাইনে!"[১৬], তখন পরিষ্কার বোঝা যায়, পিতৃতান্ত্রিক ও বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থায় রক্ত আর আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে মানবিকতাকে কত সহজে শ্বাসরোধ করা হয়। কিন্তু গল্পের চূড়ান্ত পরিণতিতে আমরা অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখতে পাই। যারা রক্তের বিশুদ্ধতা নিয়ে গর্ব করতেন, ব্যাধির ভয়ে তারাই আপনজনকে ত্যাগ করলেন। আর যাকে অস্পৃশ্য ভাবা হতো, সেই মণীষাই পরম মমতায় রোগাক্রান্ত শ্বশুরের দায়ভার গ্রহণ করে:

"বাবা, আমার তো ছেলেমেয়ে নেই, আপনি আমার বাসায় চলুন। আপনাকে আমি সুস্থ ক'রে তুলব।"[১৭]

পরিশেষে শাশুড়ির উপলব্ধি—"মা, তুই আমার মেয়ে। ...তুই ব্রাহ্মণের থেকে অনেক বড়"[১৮]— গল্পের পরিসমাপ্তিতে মূলত বর্ণবাদী সমাজের চূড়ান্ত পরাজয় এবং মানবিকতার চিরন্তন জয়গান দেখানো হয়েছে।

নকুল মল্লিকের সাহিত্যে কোনো কাল্পনিক রোমান্টিসিজমের বিলাসিতা দেখা যায় না; তাঁর সাহিত্যভুবন রুক্ষ ও ধূলিমলিন মাটির গভীর থেকে উঠে আসা প্রবহমান জীবনের অকৃত্রিম আখ্যান। তাঁর গল্পে প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনা, যন্ত্রণা, স্বপ্ন এবং সর্বোপরি সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য স্পৃহা অপূর্ব শৈল্পিক সুষমায় ফুটে উঠেছে, যা বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘকালের বিশাল শূন্যতাকে সার্থকভাবে পূর্ণ করেছে।

'চাষার ব্যাটা' গল্পে সুধন্য সরকারের অমোঘ আত্মঘোষণা, 'মরীচিকা'য় বিকাশের মানসিক দহন ও মরিচঝাঁপির রক্তস্নাত ইতিহাস, 'বার দশমী'তে ধীরেন মণ্ডলের পৌরাণিক মিথ বিনির্মাণ, 'বিবর্তন'-এ শুভদ্রার শ্রেণিগত জাগরণ, 'নেতা' গল্পের ক্ষমতাকেন্দ্রিক শঠতা, 'শূদ্রকন্যা'য় মণীষার প্রগতিশীল মানবিক উত্তরণ এবং সর্বোপরি 'দুর্গা দুর্গতিকারিনী'তে ঘোতনের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মহাকাব্যিক দ্রোহ—প্রতিটি আখ্যান প্রমাণ করে, দলিত সাহিত্য নিছক হতাশা বা কান্নার বয়ান নয়। তা শোষণের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিস্পর্ধা এবং হারানো আত্মমর্যাদা ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার। নকুল মল্লিক অবহেলিত মানুষকে করুণার পাত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেননি; তিনি নিপুণ দক্ষতায় তাঁদের রক্ত-মাংসের সংবেদনশীল ও জোরালো প্রতিবাদী সত্তায় উন্নীত করেছেন। তথাকথিত ভদ্র সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বর্ণবাদী বিধিনিষেধের অন্তঃসারশূন্যতা উন্মোচন করে, মানবিকতাকে জাতিগত বিভাজনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তিনি কলমকে সমাজ পরিবর্তনের অমোঘ অস্ত্রে পরিণত করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্য ও প্রান্তিক সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে তাঁর অসামান্য সৃজনশীল অবদান চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র (References/Bibliography):

১. নকুল মল্লিক, 'প্রবন্ধ নিবন্ধ' প্রথম খণ্ড, 'চেতনা বিকাশের আন্দোলন', কলকাতা: দলিত সাহিত্য সংসদ, ২০২১, পৃ. ১৫৬,

২. নকুল মল্লিক, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা: দলিত সাহিত্য সংসদ, ২০২৩, পৃ. ১৬

৩. তদেব, পৃ. ২৩

৪. তদেব, পৃ. ২৬

৫. Spivak, Gayatri Chakravorty. (1988). "Can the Subaltern Speak?". In Cary Nelson and Lawrence Grossberg (Eds.), Marxism and the Interpretation of Culture (First Edition, p. 308). Urbana: University of Illinois Press

৬. নকুল মল্লিক, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা: দলিত সাহিত্য সংসদ, ২০২৩, পৃ. ৬৯,
৭. তদেব, পৃ. ৭১,
৮. তদেব, পৃ. ৭৫,
৯. তদেব, পৃ.৭৬,
১০. আশিস হীরা, প্রবন্ধসংগ্রহ, মরিচঝাঁপির গণহত্যা: একালের কারবালা, কলকাতা: গাঙচিল,২০২৩ পৃ. ৯১,
১১. নকুল মল্লিক, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা: দলিত সাহিত্য সংসদ, ২০২৩, পৃ. ৬৭
১২. তদেব, পৃ. ১৪১,
১৪. তদেব, পৃ. ১৪৫,
১৫. তদেব, পৃ. ২০৪
১৬. তদেব, পৃ. ১৯৮
২০৪,
১৭. তদেব, পৃ. ২০৮
১৮. তদেব, পৃ. ২০৮
১৯. Gramsci Antonio, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, Selections From the Prison Notebooks, International Publishers New york, 1992